

বিপ্লবী

বীর আশুতোষ কালী

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত

প্রকাশক :—
শ্রীমতী রত্না ব্যানার্জী
১২, গোবিন্দ পাল লেন
কলিকাতা-২

মূল্য—·৭৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—শৈলশ্রী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১/১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রণ :—
কর্মযোগ আশ্রম প্রেস
১২১, নিউ টালিগঞ্জ,
পূর্ব্ব পুটিয়ারী,
২৪-পরগণা।

Scanned with OKEN Scanner

বিপ্লবী বীর আশুতোষ কালী

"এই দেহেই যেমন মানুষের কৌমার-যৌবন-জরা এই ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ, তাহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি মুহ্য হন না।" গীতার এই বাণী আমরা জানি "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।" তবুও আমরা আমাদের স্বভাবধর্ম ত্যাগ করিতে পারিনি, পারিনি আমাদের জীবনের সহজ সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে। তাই বিপ্লবী বীর আশুতোষের মৃত্যু দিবসে তাঁর জীবনের স্মৃতিচারণায় আজ এককালের কত কথাই না মনের কোণে উঁকি মারছে আর তাতে করে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সেই সব কথা এই মাটির পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানুষটির জন্যে সমস্ত জ্ঞান সমস্ত যুক্তিতর্ককে নস্যাৎ করে দিয়ে অজান্তে শোকের এক ঘনকৃষ্ণ কালোমেঘ আমার মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। মানুষের জন্মের আগে অন্ধকার, মৃত্যুর পরেও অন্ধকার। মানুষ এক অন্ধকার থেকে এই পৃথিবীর আলোয় আসে, আর এক অন্ধকারে চলে যায়। রেখে যায় নিকটজনের চিত্তে তাঁর এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

আশুতোষকে আমরা আমাদের অতি নিকটতম জন হিসেবেই পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম—আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে, পেয়েছিলাম আদর্শ চরিত্রের মানুষ হিসাবে, দেশাত্মবোধের মূর্ত বিগ্রহরূপে। অতি নিকটতম জন হিসেবেই পেয়েছিলাম বুঝি বা অতি পরিচিতের অবজ্ঞায় সেদিন তাঁর মহত্ত্বকে আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, বুঝে উঠতে পারিনি তাঁর দেশাত্মবোধের গভীরতা, বুঝে উঠতে পারিনি বিপ্লবী চরিত্রের ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

বাংলা ১৩১২ সাল, ইংরেজী ১৯০৫। বৈশাখ মাসের ১লা তারিখ। মেলা বসেছে বিলাসখান কালীবাড়ীতে। নববর্ষের মেলা। বহুযুগ ধরে ঠিক ঐ দিনটিতে প্রতিবছর এই মেলার অনুষ্ঠান হয়ে

Scanned with OKEN Scanner

আসছে। বিলাসখান ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সকল শ্রেণীর লোকই আছে এই গ্রামে, তবে ব্রাহ্মণ প্রধান। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা নির্বিশেষে বৎসরান্তে নববর্ষের ঐ দিনটির আগমনী প্রতিক্ষায় মাস কয়েক আগে থেকেই উৎসুক অন্তরে দিন কাটায়। তারপর নববর্ষের প্রথম দিনটি যখন পুরনো বছরের সকল সুখ দুঃখের স্মৃতিকে অন্তরের গভীরে ঠেলে দিয়ে সত্যিসত্যিই এসে হাজির হয়, তখন সেই আনন্দ মুখর দিনটিকে সবাই স্বাগত জানায় হাসিমুখে। দুর্দৈব যে সেদিন এমনি করে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বহুদিনের বহুপ্রত্যাশিত নববর্ষের সেই আনন্দ মুখর মেলাটিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে, একথা যে সেদিন কেউ ভাবতেই পারে নি। ভাববে কি করে, এ যে সেদিনের মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর।

বেলা তখন দুপুর পেরোয় নি, হঠাৎ মারমার শব্দ। প্রাণের ভয়ে কে কোথা দিয়ে পালাবে ঠিক পাচ্ছে না। এমন সময় দেখা গেলো বারো চৌদ্দ বছরের একটি সুদর্শণ ছেলে হাতে লাঠি মাথায় পাগড়ী, বুকে ভলেণ্টিয়ারের ব্যাজ নিয়ে ঐ জনতার হুল্লোড়ের মাঝখান দিয়ে নির্ভিক চিত্তে এগিয়ে আসছে যেখানে প্রাণের দায়ে জমা হয়েছে সন্তান কোলে সব মায়ের দল। মুখে তার মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনি—লাঠিখানা হাতে বাগানো রয়েছে দৃঢ়মুষ্টিতে। হঠাৎ পেছন থেকে গুণ্ডামাফিক একজন মুসলমান এসে ছোঁ মেরে তার হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে ছুটে চলে যায় অন্যদিকে বালকটি তখন শুধু হাতেই ভীর ঠেলে এগিয়ে চলে তার গন্তব্যের দিকে।

সেদিন মনে তার জাগ্রত রয়েছে একটি কথা—সে যে ভলেণ্টিয়ার, তার ওপর যে রয়েছে মেলার শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব বিশেষ। হৈ হুল্লোড়ের সময় নারী ও শিশুদের রক্ষার ভার যে তাদেরই ওপর ন্যাস্ত। ইতিমধ্যে

অপরের রক্ষার চিন্তায় আত্মরক্ষার কথা সে একদম ভুলেই বসে আছে। কে একজন মেয়েদের ঘেরাওর ভেতর থেকে ডেকে বলে "আশু, শীগগীর ভেতরে চলে আয়।" উত্তরে আশু বলে না আমাদের যে বাইরেই দাঁড়াতে হবে ওদের রুখতে। ঐ একটি মাত্র চিন্তা তার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে যে ভলেন্টিয়ার—তার কাজ হচ্ছে বিপদগ্রস্তকে বিপন্মুক্ত করা, ভীত গ্রস্তকে অভয় দেওয়া, দুর্বলকে সবলের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা। এত গুরুদায়িত্ব যার স্কন্ধে সে কি পারে প্রাণের ভয়ে কর্তব্য ছেড়ে দূরে সরে থাকতে।

দুপুরের প্রচণ্ড রোদ, লোকের ভীর, পিপাসায় জিভ শুকিয়ে উঠছে, তৃষ্ণায় মানুষের ছাতি ফেটে যায়, মানুষগুলো যেন হন্যে হয়ে যায়, কী যে করবে কিছুই ঠিক পাচ্ছে না। এ তৃষ্ণা মেটাতে পারে হয় জল না হয় শোনিত। তৃষ্ণায় জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে আশুর —তবুও সে নিজের স্থানে অচল অনড়।

এদিকে মারমার শব্দ তখনও চলছে পুরোদমে। কত জনের যে মাথা ফেটেছে, কত জনের যে গা ছড়েছে, আর কতজনের যে ভেঙ্গেছে হাত পা তার খবর কে রাখে। ঘণ্টাখানেক মারামারি মাতামাতির পর মেলা যখন প্রায় লোক শূন্য তখন দেখা গেল এতো মেলা নয়, এ যেন রণক্লান্ত এক রণক্ষেত্র। এই মেলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করল কে বা কাহারা এই খোঁজ যখন পড়ল তখন হদিস পাওয়া গেল কোথায় এর উৎপত্তিস্থল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রক্ষকই ভক্ষক হয়ে বসে আছে অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীরই ভেদনীতি কার্যকরী হয়ে উঠেছে এখানে। হিন্দুর অনুষ্ঠান এই মেলা মুসলমানের পক্ষে এই মেলাতে যোগ দেওয়া গুণা। শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতার এই মনোভাবটি অতি চতুরতার সঙ্গে একটি ছোট বাঁশী কেনার মাধ্যমে কার্যকরী করে তুলেছে। তারই ফলশ্রুতি পারস্পরিক এই বিদ্বেষ হিংসা হানাহানি।

আশুতোষকে সেদিন বিদেশী শাসকের এই সর্বনাশা চক্রান্তি জালের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন তার বড়োরা। তাই সেদিন সে বড়োদের অনুসরণে মনে মনে সংকল্প নিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো সংজ্ঘং শরণং গচ্ছামি। আশুতোষ সেদিন থেকে মনে মনে সভ্য হলেন অনুশীলন সমিতির, দীক্ষা নিলেন বন্দেমাতরম মন্ত্রে আর আশ্রয় নিলেন সংঘ নেতার। সেই যে কবে ১৩১২ সালের ১লা বৈশাখ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন আশুতোষ, সেই মন্ত্রজপ তাঁর সমাপ্তি মানলো চুয়াত্তর বছর বয়সে ১৩৭২ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ রাত আটটায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে।

কিন্তু দশ বারো বছর বয়সে যেদিন থেকে তিনি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন, সেদিন থেকে একমাত্র দেশমাতৃকাই তাঁর আজীবনের আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হয়। অন্য ধর্ম বা দেবদেবী তিনি জানতেন না। পূজা অর্চনারূপ আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর তেমন বিশ্বাস না থাকলেও তিনি অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠানের চেয়ে পূজার্চনারূপ ধর্মকর্ম উৎসব অনুষ্ঠানই পছন্দ করতেন। এতেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি অনুশীলনতত্ত্বে এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তিনি জীবনকে কোন সময়ের জন্যেই চটুল আমোদ প্রমোদে মত্ত হতে দেননি। আমোদ প্রমোদ যদি করতে হয় তবে তাও যেন সদ্বস্তু ও সদানুষ্ঠান নিয়েই হয়, যা মানুষের মনে কখনও দুর্বলতা বা অবসাদ আনবে না। আশুতোষকে আমরা কখনও গান বাজনা যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতির আসরে গান বাজনা শোনার উদ্দেশ্যে দেখিনি। আশুতোষ জন্মেছিলেন ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত বিলাসখান গ্রামের এক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা ৺ঈশ্বর চন্দ্র কালী মহাশয় ছিলেন এক সহজ সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন ছিল তার কাজ। মাতা শ্যামাসুন্দরী ছিলেন অত্যন্ত শান্ত স্বভাব ধর্মপরায়না ও নিষ্ঠাবতী মহিলা।

আশুতোষেরা পাঁচ ভাই তিন বোন। এক ভাই এক বোন অতি শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে। ভাই-বোনেদের মধ্যে আশুতোষ সর্বকনিষ্ঠ হওয়ায় সকলেরই আদরের ছিলেন। অতিরিক্ত আদরে স্বভাবত ছেলেরা অতি দুরন্ত ও স্বার্থপর হতে চায়। তিনি ছিলেন শান্ত, হৃদয়বান, ন্যায়নিষ্ঠ ও সাহসী। পিতামাতার ধর্মভাবটি তিনি জন্মগত ভাবেই যেন পেয়েছিলেন। ছোট সময়ে তাই তাঁকে দেখা যায় দেবতার মন্দির নির্মাণ ও তাতে বিগ্রহ স্থাপনের মেলায়। দেখেছি তাঁকে দলবল নিয়ে হাজির থাকতে যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সেখানে কখনো কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, না পারে তাদের কোন অসদুদ্দেশ্য সাধন করতে।

ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে যে তাঁর খুব একটা নাম ছিল এমনটা আমরা শুনি নি, তবে পরবর্তী জীবনে পরিচয় পেয়েছি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির। তিনি ১৯১ সালে পালং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। আশুতোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে রাজসাহী কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বছর খানেক থাকার পর কলকাতার কোন এক কলেজে ভর্তি হবার জন্য চলে আসেন। ভর্তিও হলেন কলেজে কিন্তু ভর্তি পর্যন্তই। পড়াশুনার নামে কিছুই না। কারণ আশুতোষের কাজ হচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের ভিতরে সমিতির আদর্শ প্রচার ও সংগঠন।

স্কুল জীবনেই আশুতোষ অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। পালং স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। এই পালংএ তখন ছাত্র তথা যুব সমাজে বীরেন্দ্রনাথ সেন (ভোলা) এর খুব প্রভাব। বীরেন্দ্রনাথের যেমন ছিল স্বাস্থ্য, শক্তি তেমনি ছিল বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগঠন শক্তি। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ কিন্তু সংসারের মায়া মোহ তাঁকে একদিনের জন্যেও আটকাতে পারে নি। অনুশীলন সমিতির সংগঠন কার্যেই তিনি জীবনপাত করেন। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বীরেন্দ্রনাথের মত একজন আদর্শ কর্মীকে কলেরা রোগে

অকালে প্রাণ হারাতে হয়। আশুতোষের স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষা বলতে গেলে এই বীরেন্দ্রনাথের কাছেই প্রথম।

কলকাতায় কলেজে ভর্তি হবার পর হোস্টেল খরচ, কলেজের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবদ আশুতোষের বড়দা যে কটি টাকা পাঠাতেন, আশুতোষ সেই টাকা থেকে নিজের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে কিছু টাকা জমাতেন এবং ঐ জমানো টাকাই ছিল তাঁর চলার পথের পাথেয়। তখনকার দিনে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে যারাই আসতেন প্রত্যেককেই সমিতির জন্য যথাসাধ্য কাজ করতে হত। এই সাধ্যানুযায়ী কথাটা এক হিসাবে কতকটা Vague কথা হলেও সমিতির নেতার কাছে কিন্তু মোটেই Vague ছিল না। তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির আওতায় একবার এসে গেলে আর কারুর পক্ষে কোন ফাঁকফাঁকির পথ ছিল না। নেতা ভালভাবেই জানতেন কার কতটুকু ক্ষমতা, কাজের ভার ও তাই তেমনি নেতার নির্দেশই অর্পিত হত প্রত্যেকটি কর্মীর উপর। সেখানে কারুর কোন ওজর আপত্তি চলতো না। নেতার কঠোর নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রত্যেকটি কর্মীকেই মেনে চলতে হত। না মানলে তার শাস্তি মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারত। সমিতির নেতৃবৃন্দকে সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলা হত। দয়ামায়ার স্থান সেখানে ছিল না এমন কথা নয়—স্নেহ ছিল, ভালোবাসা ছিল, ছিল শ্রদ্ধা কিন্তু সেই স্নেহ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অন্যায়ের দণ্ড বিধানে কখনই পথের বাধা হয়ে উঠতো না। সেখানে ন্যায়ের দণ্ড নির্মম নিষ্ঠুর দুর্মদ। সেদিনের সমিতির সভ্যগণকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা হত, যাতে করে তারা সদা স্মরণে রাখতে পারে যে, তাদের জীবন দেশমাতৃকার সেবায় সমর্পিত। এই সমর্পিত জীবনে ব্যক্তি স্বার্থের স্থান ছিল না, স্থান ছিল না আত্মীয়-স্বজন বা সংসারাসক্তির।

যাঁরা সর্বস্ব পন করে কাজে নামতেন না—কাজ করতেন সংসারে থেকে অর্থ দিয়ে আশ্রয় দিয়ে, তাঁরাও মনে মনে জানতেন প্রয়োজনের

দিনে যদি ডাক আসে ঘর ছাড়ার, সেদিন বিনা বাক্য ব্যয়ে মুহূর্ত বিলম্ব না করে নেতার নির্দ্দেশ পালনে তৎপর হতে হবে। এরা ছিলেন যেন রাষ্ট্রের সেনা বাহিনীর রিজার্ভ ফোর্স। আশুতোষের জীবন ছিল দেশমাতৃকার সেবায় সমর্পিত জীবন কাজেই পড়াশুনা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল দেশমাতৃকার সেবার জন্যে কর্মীদল সংগঠন। এই কাজের জন্য তিনি বেশীদিন এক জায়গায় থাকতে পারতেন না। তাকে কিছুদিন পরপরই স্থানবদল করতে হত, ফলে বদল করতে হত কলেজও।

গুপ্ত সমিতির কাজ একভাবে বেশীদিন চলে না—চলার পথের বাঁকে বাঁকে কর্মীকে তাই রূপ পরিবর্তন করে সাজতে হয় বহুরূপী। আশুতোষকেও তাই করতে হল। এবারে ছাত্র রূপ নিল শিক্ষকের। এতদিন যে ছিল ছাত্র এখন থেকে তিনি হলেন শিক্ষক। এবারে আর কলেজ নয়, এবারে স্কুল। কখনও স্কুল মাষ্টার কখনও বা গৃহ শিক্ষক। আশুতোযকেও কখনও দেখা যাচ্ছে ময়মনসিংহে, কখনও ত্রিপুরায়, কখনও বা ঢাকায়। এবারে শুধুমাত্র সমিতির শাখা সংগঠন নয়, এবারে স্কন্ধে রয়েছে বিরাট দায়িত্ব মানুষ গড়ার। এখানে আর ফাঁক ফাঁকি নয়—সোজা নিজে আচরি ধর্ম অপরে শিখায়। আশুতোষের জীবন এতদিন যাও বা এক আধটুকুন জড়িত ছিল সংসারের সঙ্গে এবারে তা একেবারে বিচ্ছিন্ন হল দেহের দিক থেকে নয় মনের দিক থেকে। দেশের চিন্তা যা মনকে গ্রাস করেছে সে মনে সংসারের স্থান কোথায়! তবুও তাঁর জীবনে দেখেছি এক অদ্ভুত মানসিকতা। সত্যিকারের গীতার নিষ্কাম কর্মীর আদর্শ। কর্মই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। তাই তাকে দেখিনি কখনও কর্মহীন অবস্থায়। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন একটা না একটা কাজ নিয়েই তিনি থাকতেন সে সংসারেই হোক আর সংসারের বাহিরেই হোক। যখন তাঁর বাইরের কাজ থাকতো না তখনই তিনি বাড়ী চলে আসতেন। বাড়ী এলে দেখেছি তাঁকে ঘোর আসক্ত সংসারীর মত ঘরের কাজ করতো কোথায় ঘর অপরিষ্কার রয়েছে, কোথায় জমেছে

জঞ্জাল, কোথায় হয়েছে জঙ্গল, কোথায় পুকুর ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে গেছে এর কোনটাই তাঁর দৃষ্টি এড়াতোনা—সঙ্গে সঙ্গে লেগে যেতেন সব কিছুর সংস্কার সাধনে। গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলারা বলতেন, "আশু তুই যে কেন সংসারী হলিনে বুঝতে পারিনে যারা সংসার করে, তাদেরতো দেখিনে তোর মত এমনি করে সংসারের মানুষের দুঃখ বুঝতে"। গীতার বাণী আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সম্য পশ্যতি যো অর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। তাঁর জীবনে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। নিজের সুখ দুঃখ দিয়ে তিনি অপরের সুখ দুঃখের বিচার করতেন।

স্নেহ ভালোবাসা মায়া মমতা ছিল তাঁর অন্তরে অগাধ কিন্তু তাঁর প্রকাশ ছিল কাজের মাধ্যমে—বাক্যে নয় সময় সময় তাঁকে সংসারের কাজে এমন ভাবে লিপ্ত হতে দেখেছি যে, এই মানুষ যে আবার প্রয়োজনের দিনে চোখ বুঝে সংসারের সবকিছু পেছনে ফেলে বেরিয়ে যেতে পারে নেতার আহ্বানে. সে কথা আমাদের মন কিছুতেই ভাবতে পরেতো না। গীতার বাণী—যস্যনাহং কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি ছিলেন কর্মযোগী তার কর্ম ছিল আসক্তিহীন। সব কিছুতেই তিনি ছিলেন কিন্তু কোনটাতেই তিনি ছিলেন না। এই আসক্তিহীন জীবন ছিল বলেই —মাতার অশ্রু, ভগিনীর ক্রন্দন কোনদিনই তাকে তার আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারেনি—বিচলিত করতে পারেনি সংঘ চিন্তা থেকে—বিভ্রান্ত করতে পারেনি নেতার নির্দেশ পালনের পথে সহস্র বাধা মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে।

১৯১৪ সাল ইউরোপ খণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জড়িত হয়ে পড়ে এই বিশ্বযুদ্ধে। ইংরেজের এই সমূহ বিপদ সেদিনের পরাধীন ভারতবাসীকে দিল মুক্তির দিশারী, আলোর সন্ধান। ইংরেজের বৈরী পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল ভারতবাসী। জার্মান ক্রুজার এমডেন, জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই

করে পাড়ি জমালো ভারতবর্ষের দিকে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য্য হয় মহান বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারীর নেতৃত্বে সারা ভারত সশস্ত্র বিপ্লবভ্যুত্থানের। নেতার নির্দেশে বিপ্লবীরা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ ঘাঁটি আগলে রাখার জন্যে। সব কিছুই ঠিক হয়েছিল সেদিন কিন্তু মানুষের অলক্ষ্যে নিয়তি যে হাসছিল সেদিন, সে হাসির শব্দ তো কারুর কানে এসে পৌঁছেনি। তাই তো লোক চক্ষুর অন্তরালে কত প্রাণই না বলি গেল দেশমাতৃকার চরণে সে হিসাব কে রাখে?

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সাথে সাথেই দলের নির্দেশে আশুতোষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লব সংগঠনের কাজে। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতব্যাপী যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হল, আশুতোষ সর্বশক্তি নিয়ে কাজ শুরু করলেন সে অভ্যুত্থান সফল করতে; গেলেন সৈন্য ব্যারাকে। বৃটিশ সরকারও চুপ করে রইল না। গোয়েন্দার জাল বিছিয়ে দিল দেশের সর্বত্র। সৈন্যদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করতে যেয়ে আশুতোষ ধরা পড়লেন এলাহাবাদে। সে ১৯১৬ সাল। অমানুষিক নির্যাতন হল তার ওপর কিন্তু আশুতোষ সে নির্যাতন সহ্য করলেন মুখ বুজে; একটি কথাও বের করতে পারল না সরকার। তাঁকে বন্দী করা হল ভারত রক্ষা আইনে। প্রথমে এলাহাবাদ জেলে, পরে বদলী করল আগ্রা সেন্ট্রাল জেলে। অনেক পরে অন্তরীণ করা হল কুতুবদিয়ায়। অন্তরীণ হতে আশুতোষ পলাতক হয়ে পুনরায় সাংগঠনিক কাজে মন দিলেন কিন্তু বাইরে বেশীদিন থাকতে পারলেন না। ধরা পড়লেন। এবার দালান্দা হাউসে। দালান্দা হতে তিন আইনে স্টেট প্রিজনার [State Prisoner] করে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হলেন। মেদিনীপুর হতে আলিপুর ও রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে। মুক্তি লাভ করেন ১৯২১-এ। সেই যে যাত্রা শুরু—বন্দীশালার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে যাবার—তা আর শেষ হল না। শেষ হল—দেশ বিভাগের সামান্য পূর্বে-১৯৪৬

Scanned with OKEN Scanner

সালে। ১৯২৪-এ B.C.L.A. তে বন্দী হয়ে বাংলার বাইরে রায়পুর ও অন্যত্র বন্দীজীবন যাপন করলেন আশুতোষ—মুক্তি পেলেন ১৯২৮-এ। পুনরায় পলাতক অবস্থায়— ১৯৩১-এ বন্দী হয়ে—১৯৩৮-এ মুক্তি লাভ করেন। আবার ১৯৪০-এ পলাতক অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে মুক্তি ১৯৪৬-এ। এভাবে জীবনের প্রায় ২২/২৩ বৎসর কাল তার কেটে যায়—বন্দীশালায়। নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে আশুতোষ হয়ে ওঠেন অগ্নিশুদ্ধ এক নির্মল আদর্শবাদী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ দেশনায়ক। দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল শিখায় পরিণত হয় তার জীবন।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগকে আশুতোষ কখনও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু প্রতিরোধ করতে না পারার বেদনা ও জ্বালা তাকে দগ্ধ করেছে সারাজীবন। স্বাধীনোত্তর ভারতের অন্তহীন সমস্যায় যখন দেশ দোলায়িত, পূর্ব-বঙ্গাগত নিপীড়িত, নির্যাতিত, গৃহহীন, সহায় সম্পদহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ এ পাড়ে এসে যখন ভীড় করলেন—আশুতোষের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রতিকারের চেষ্টা করলেন—কিন্তু ব্যর্থ হলেন। বুঝলেন—এই রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি—আদর্শনিষ্ঠ কর্মী গোষ্ঠীর একান্ত প্রয়োজন—যারা ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হবে। সমচিন্তায় উদ্বুদ্ধ বন্ধু, সাথী ও বিপ্লব যজ্ঞের অন্যতম প্রাণ পুরুষ কেদারেশ্বর সেন মিলিত হলেন তার সাথে। মিলিত হলেন কর্মবীর তরণী সোম। যোগেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য, চিন্তানায়ক নলিনী কিশোর গুহ, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। সরকারী সাহায্যমুক্ত স্বাবলম্বনভিত্তিক একটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলবার পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করলেন। সম্পূর্ণ বন্ধুদের দানে তিল তিল করে গড়ে তুললেন—অনুশীলন ভবন টালিগঞ্জের কুঁদঘাটে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থেকে জাতি গঠনের মহান আদর্শ নিয়ে সৃষ্টি হবে নূতন কর্মী দল—এই মানুষ গড়ার কাজই হল তাদের স্বপ্ন। ১৯৬০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত

Scanned with OKEN Scanner

হল অনুশীলন ভবন। দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য জাতির—ভবনের প্রাণপুরুষ কেদারেশ্বর সেন লোকান্তরিত হলেন—ভবন প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে, আশুতোষের তিরোধান হল পাঁচ বৎসর মধ্যে ১৯৬৫ সনে। যৌবনের প্রারম্ভে যে স্বপ্ন নিয়ে আশুতোষ বিপ্লব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—তা সফল হয় নি হয়তো—কিন্তু আদর্শের যে প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—সে আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি কোনদিন। তাদের শেষ গঠনমূলক কীর্তি অনুশীলন ভবনের মধ্যে জ্বেলে গেছেন—সে আদর্শেরই হোম শিখা—যাকে উজ্জীবিত রাখার দায়িত্ব উত্তর সূরীদের।

—০—

ক্ষীরোদকুমার দত্ত প্রনীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১।	বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা	—	৮·০০
২।	ভারতীয় ঐক্য সাধনা	—	৩·০০
৩।	অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির	—	২·০০
৪।	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি		৪·০০
৫।	মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র	—	৪০
৬।	শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ	—	৬০
৭।	কলতা বাজার সংগ্রাম	—	৪০
৮।	গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী	—	১·০০
৯।	হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা ও রাসবিহারী	—	·৭৫
১০।	দেশ যাদের ভোলেনি ১	—	১·০০
১১।	দেশ যাদের ভোলেনি ২	—	১·০০
১২।	রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি	—	·৬০
১৩।	১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস	—	১·০০
১৪।	বিপ্লবী বিবেকানন্দ	—	·৫০
১৫।	ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস	—	·৪০
১৬।	স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে	—	·৫০
১৭।	বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ	—	·৬০
১৮।	লাট হত্যা প্রচেষ্টা	—	১·৫০
১৯।	ভারতের নব জাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা	—	·৫০
২০।	কাকোরী শহীদবৃন্দ	—	১·০০
২১।	অতীতের স্মৃতি—শশীশেখর সান্যাল	—	১·০০
২২।	প্রবীণ বিপ্লবী—ডাঃ তারকনাথ দাস	—	·৫০
২৩।	অনুশীলন চন্দননগর মিলন—অমৃত হাজরা	—	·৫০
২৪।	বিপ্লবী নায়ক কেদারেশ্বর সেন	—	·৫০
২৫।	বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা	—	১·০০

Scanned with OKEN Scanner